বাঙালির বটতলা

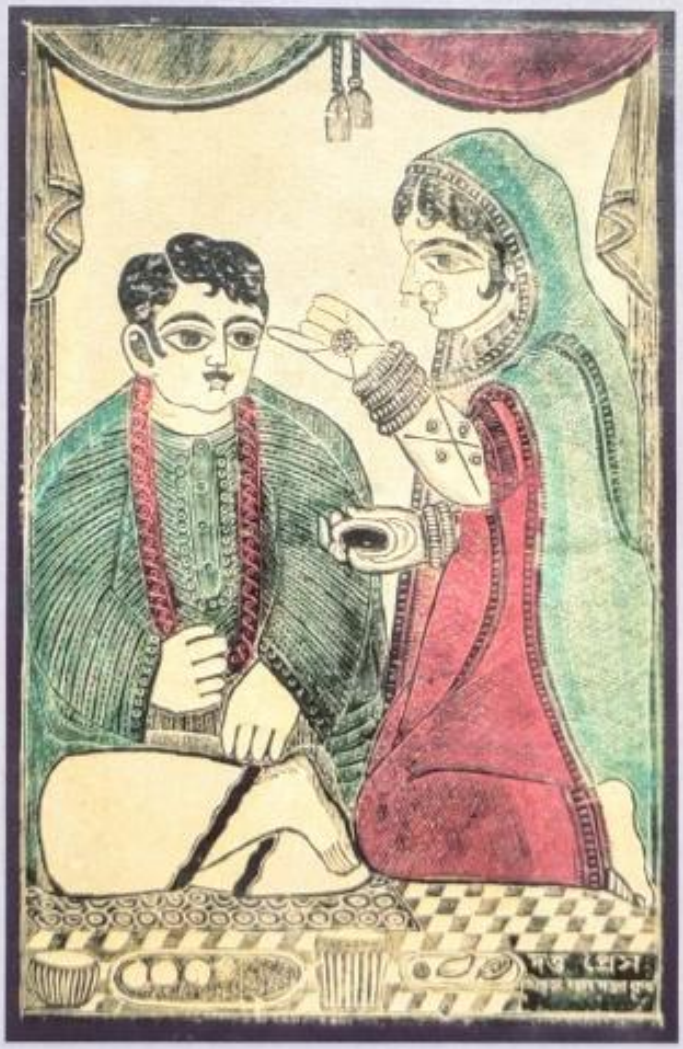

সম্পাদনা
অদ্রীশ বিশ্বাস
অনিল আচার্য

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০২১

© অনুষ্টুপ

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত এই বইয়ের কোনো অংশের মুদ্রণ, পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপিকরণ করা যাবে না। ফোটোকপি বা তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পুনরুৎপাদন করা হলে তা আইনগতভাবে অবৈধ এবং এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN- 978-81-952373-0-2

প্রকাশক: অনুষ্টুপের পক্ষে অতীশ ঘোষ
অনুষ্টুপ প্রকাশনী
২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯

মুদ্রণ ও বাঁধাই: ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রা. লি.
১৪৩ ওল্ড যশোর রোড, গঙ্গানগর, কলকাতা-১৩২

Bangalir Bottala Vol. II
A Collection of Writings, Reprints and
Paintings Relating to Bottala.
Edited by
Adrish Biswas & Anil Acharya

Published by ANUSTUP PRAKASHANI
2E Nabin Kundu Lane, Kolkata-9

প্রচ্ছদ: রাতুল চন্দ রায়

বর্ণবিন্যাস: রাজু রায়

মূল্য ৩৫০ টাকা

সূচি

প্রাক্‌কথন	৯
উনিশ শতকের বাংলায় লোকশিক্ষা ও বটতলা সাহিত্য: সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫
ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র ও বটতলা: প্রবীরকুমার বৈদ্য	২৫
বটতলার 'আদিরসাত্মক' বই: অর্ণব সাহা	৪৫
ঢাকার বটতলার খোঁজে: মুনতাসির মামুন	৮৫
বটতলার নববর্ষ: অদ্রীশ বিশ্বাস	১১৮
বটতলার গান: একটি অচর্চিত সংগীতধারা: অদ্রীশ বিশ্বাস	১২৫
বাসরকৈতুক নাটক: শ্যামাচরণ দে প্রণীত	১৪১
টম জোন্স্ নামক রহস্য নাটক (প্রথম ভাগ): মহেশচন্দ্র দাস, গোপালচন্দ্র নাথ প্রণীত ১৮৩৬	১৭৪
কন্যা বিক্রয় নাটক: পাবনা বাসী	১৮৫
বটতলা বিষয়ক প্রবন্ধ ও বইয়ের তালিকা: কুন্তল রায়	২০৮

ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র ও বটতলা

প্রবীরকুমার বৈদ্য

... অশ্লীল ভাষার বিপক্ষে পিনাল কোডে যে একটি বিধি আছে, তাহা চিরকাল বিধিবদ্ধই রহিয়া গেল। অশ্লীল ভাষা ব্যবহার জন্য কেহ কখনো এদেশে শাস্তি পাইয়াছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অথচ এই পাপের জন্য জনসমাজে প্রতিদিন শত শত বালক-বালিকা উৎসন্ন যাইতেছে। আমরা একটি প্রস্তাব করি, এবং আশা করি আমাদিগের ইংরাজি লেখক সহযোগীরা এই প্রস্তাবটির সহায়তা করিবেন। কলিকাতার মধ্যে কতকগুলি অবৈতনিক ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করা হয় যাহারা এইরূপ অশ্লীল ভাষী লোক দেখিবা মাত্র তাহার নামে পুলিশে রিপোর্ট করিবে। এবং পুলিশ তাহাকে বিচারপতির সম্মুখে আনিবে, এবং বিচারে বিধি পূর্বক তাহার দণ্ড হইবে...।[১]

... কিছুদিন হইল 'গালাগালি' বিষয়ে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা লইয়া কিঞ্চিৎ আন্দোলন হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন পথে ও পুস্তকের জঘন্য ভাষা নিবারণ হওয়া উচিত। আমরা বলি কেবল উচিত নহে, কিন্তু ইহা না হইলে ভদ্রলোকের সহরে বাস করা দায়। ইহা কোথায় কমিবে, না ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ইতর লোকদিগের কথা ও ব্যবহার ভদ্রলোকের মুখে উঠিতেছে। যাহারা 'কি মজার শনিবার' ইত্যাদি কতকগুলি বাজে পুস্তক লিখিয়া বাহাদুরী প্রকাশ করিতে চাহেন, বটতলা যাঁহাদের বিদ্যা প্রচারের স্থান, স্কুলের বালকগণের সর্বনাশ করা যাহাদের জীবনের লক্ষ্য, এবং আপনাদের মনের দুর্গন্ধ পঙ্ক যাঁহারা ঘরে বাহিরে ছড়াইতে ভালোবাসেন, সেই অসাধারণ ভদ্রলোকদিগের চরিত্র আর আমরা লুকাইয়া রাখিতে পারি না। বিচারপতি ও কারারক্ষকদিগের সঙ্গ পাইতে তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ অধিক ঘনিষ্ঠতা জন্মে এই আমাদিগের সরল কামনা...।[২]

কথাগুলো কেশবচন্দ্র সেনের। বটতলা ও অশ্লীলতাকে তিনি রাখছেন একই মুদ্রার এপিঠ ও ওপিঠে। তাঁর পরিচালিত *সুলভ সমাচার*-এর বিভিন্ন সংখ্যায় এধরনের মন্তব্যের অভাব নেই। শুধু কি *সুলভ সমাচার*? *ইন্ডিয়ান মিরর, ধর্মতত্ত্ব, মদ না গরল* প্রভৃতি পত্রিকায় অশ্লীলতার বিষয়টি নিয়ে তিনি সরব হলেন। এ নিয়ে বক্তৃতা করলেন সভা-সমিতিতে। তখন তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা। তাঁর কথায় ওঠে-বসে সমাজের অধিকাংশ মানুষ। কিন্তু তিনি জানেন, শুধুমাত্র নিজের সমাজের মানুষজনকে দিয়ে একে ঠেকানো যাবে না। কারণ এর আগেও এই ধরনের পদক্ষেপ যে নেওয়া হয়নি তা তো নয়, মিশনারিরা এ নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন জেমস লঙ— ১৮৫৬-য় একটি আইন করে ছেড়েছিলেন। তবুও বটতলার বাজারকে কিন্তু রোখা যায়নি। সাময়িকভাবে কিছু মানুষকে ধরপাকড় বা বইপত্র পুড়িয়ে ফেলার মতো ঘটনা ঘটলেও বটতলা চলেছে বটতলার মেজাজেই। তাই কেশবচন্দ্র একজোট হয়ে এর বিরুদ্ধে ঝাঁপাতে চাইলেন। সমর্থনের অভাব হলো না। ১৮৭৩-এর ২০ সেপ্টেম্বর কলকাতার টাউন হলে গঠিত হলো অশ্লীলতা নিবারণী সভা। ঘোষণা করা হলো, অশ্লীলতা নিবারণের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধি যাতে যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়, তা দেখাই হবে সমিতির প্রধান কাজ। চব্বিশ জন বিশিষ্ট মানুষকে নিয়ে গঠিত কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ, রেভারেন্ড ওয়েঙ্গার আর কেশবচন্দ্র সেন সহ-সভাপতি। সম্পাদক রেভারেন্ড সূর্যকুমার ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ সেন। মুনশি আমির আলি, আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলি, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেন্ড বিপ্রচরণ চক্রবর্তী, দুর্গামোহন দাশ, উমেশচন্দ্র দত্ত, রেভারেন্ড জর্জ কেরি, মৌলবি কবিরুদ্দিন আহমদ, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রেভারেন্ড জেমস পেন, রেভারেন্ড রবিনসন, জেমস উইলসন ও প্যারীচরণ সরকার হলেন কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য।[৩]

সভার পক্ষ থেকে নিয়োগ করা হলো একদল স্বেচ্ছাসেবক। বটতলার কোন প্রকাশকের কাছে অশ্লীল বই আছে, কোন হকার ফিরি করছে ঐ ধরনের বই, রাস্তাঘাটে গালাগাল করছে কারা, সেসব দিকে তাদের কড়া নজর থাকবে। হাতে হাতে ফলও পাওয়া গেল। অশ্লীল বই রাখার অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করল অনেককে। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে অনেক পুস্তক ব্যবসায়ী অভিযুক্তদের

পাশে দাঁড়ালেন। চাঁদা তুলে তাদের তরফ থেকে নিয়োগ করা হলো ব্যারিস্টার। শুরু হলো আইনি লড়াই। কিছু প্রকাশক প্রথম অপরাধী বলে ছাড় পেলেন, কিন্তু অধিকাংশ প্রকাশককে গুনতে হল ট্যাঁকের পয়সা। এই ধরনের ফলাফলে কেশবচন্দ্রের *সুলভ সমাচার* লিখল— 'পুস্তক বিক্রেতারা এখন হইতে সাবধান হও, আর কেহ অশ্লীল পুস্তক বিক্রয় করিয়া অপরাধী হইও না।'[৪]

সুলভ সমাচার-এর হুঁশিয়ারিতে খুব একটা কাজ হলো না। অশ্লীলতার জিগিরে মুড়ি-মিছরি এক হয়ে যাওয়ার জোগাড় দেখে, বিরক্ত হলেন অনেকেই। যেসব মানুষ *বিদ্যাসুন্দর* পড়ে, কাঁসারিপাড়ার সঙ দেখে, দাশরথি রায়ের পাঁচালি শুনে অবসর সময়ে একটু আনন্দ করত, অশ্লীলতা নিবারণী সভার গেরোয় পড়ে তা লাটে উঠল। বটতলার প্রকাশকরাও ছেড়ে কথা কইলেন না। এ নিয়ে বের করলেন বেশ কিছু বই। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের *উঃ মহান্তের এই কাজ* প্রহসনের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণই আলাদা। কিন্তু সেখানেও উঠে এল অশ্লীলতার প্রসঙ্গ—

ভুবন ॥ আরে আরে শুন্‌ছ, কেশববাবু নাকি আইন কর্চ্চেন, খারাপ কথা কইলে ম্যাদ হবে।

যাদু ॥ হ্যাঁ, যাতে অশ্লীল ভাষা নিবারণ হয়, তারই জন্যে চেষ্টা হচ্ছে। তা কেবল কেশববাবু কেন আরও অনেক বড় ২ লোকও তাতে আছেন। সনাতন ধর্ম রক্ষিণী সভাও তাতে আছে।

ভুবন ॥ এই আশ্চে রোববার বিদ্যাসুন্দর পোড়াবে। খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছে।

বিনি ॥ বিদ্যাসুন্দর একখানা অশ্লীল বই তার আর সন্দেহ কি।

যদু ॥ বাবুরা আবার সক করে ঐ বই পরিবারদের পড়িতে দেন।

ভুবন ॥ বাঙ্গালা হলেই যত দোষ! ইংরাজী কত বয়ে বিদ্যাসুন্দরের চেয়ে যে শত গুণে অশ্লীল আছে, তা কিন্তু এন্ট্রেন্স কোর্সে থাকে; ছেলেরা তা শতবার অম্লানবদনে বাপমা গুরুজনের সামনে পড়ে, তার বেলা দোষ হয় না— সেযে ইংরাজী বই![৫]

অশ্লীলতা নিবারণী সভা কাঁসারিপাড়ার সঙ নিষিদ্ধ করেছিল।[৬] কিন্তু তা সত্ত্বেও চৈত্র-সংক্রান্তির দিন তাদের রোখা যায়নি। পুলিশ ও আইনের তোয়াক্কা না করে বেরিয়েছিল সেই সঙ। তাদের মুখে নতুন গান। সেই গানে অশ্লীলতা নিবারণী সভার উদ্দেশ্যে ছোড়া হলো চ্যালেঞ্জ। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম উঠে এল।

কেশবচন্দ্রকেও এত হাত নিলেন তারা—

আজব সহর কল্‌কেতা।
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে,
বলিহারি সভ্যতা॥
সহরে এক নতুন হুজুগ
উঠেচে রে ভাই,
অশ্লীলতা শব্দ মোরা
আগে শুনি নাই
...
সে দিন দেখ্‌, থিয়েটারের
যত দলবলে,
মারপিট কোরে জেলে দিলে,
তাদের সকলে,
মরি আনন্দেতে "মিরর" হাসেন,
ব্রহ্মজ্ঞানের কি কেতা।[৭]

কাঁসারিপাড়ার এই সঙটি প্রকাশ করেছিল হাটখোলার *বসন্তক*। সচিত্র এই পত্রিকাটি অশ্লীলতা নিবারণী সভাকে ব্যঙ্গ করেছে বেশ কয়েকটি সংখ্যায়। শুধু অশ্লীলতা নিবারণী সভাই কেন, কেশবপন্থী ব্রাহ্মদের সুযোগ পেলেই খোঁচা দিতে ছাড়ত না *বসন্তক*। বিশেষত ব্রাহ্মসমাজে নারীদের যোগদান নিয়ে কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টা *বসন্তক*-এর কাছে বাড়াবাড়ি ঠেকেছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত প্রথা ভেঙে হয়েছিল এ কাজ। এ নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের মতানৈক্য একসময় চরমে পৌঁছেছিল। কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছিল ব্রাহ্মিকা সমাজ। তারপর থেকেই ব্রাহ্মসমাজের কাজকর্মে, উপাসনায় স-স্ত্রীক যোগদান এক ধরনের ফ্যাসনে পরিণত হয়। *বসন্তক* এনিয়ে দু'চার কথা শোনাতে ছাড়েনি—

ব্রাহ্মিকার বাহিরে গমন

শ্রীযুক্ত অষ্টাবক্র তরফদার প্রেমে বিগলিত হইয়া স্বীয় প্রিয়পত্নীকে বলিলেন, মাই ডিয়ার। ওঠ, তোমায় নুতন পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইবেক। কেবল ফিন্‌ফিনে সাড়ী পরিয়া সমাজে যাওয়া উচিত নয়; এই বলিয়া পত্নীর গাত্র

> ধারণ পূর্বক হাঁপাতে হাঁপাতে তাহার পায়ে বুট পরাইয়া দিলেন। পরে গাত্রে কামীজ, তদুপরি ঘাগ্রা ও তদুপরি ওড়না দিয়া হস্ত ধারণ পূর্বক মরাল-দম্পতীর ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মিকা নূতন পরিচ্ছেদে কিঞ্চিৎ অস্বচ্ছন্দ হইলেন; কিছু দুর গিয়া বুটের বেগ ধারণ করিতে না পারিয়া "ধড়াৎ কোরে" আছাড় খাইলেন। পথিক লোক সকল, নিকটে আসিয়া তাঁহার স্বামীকে বলিল, বাবু বোধ হইতেছে, এ পরিচ্ছদ হঠাৎ হইয়াছে, সকল কর্মই ক্রমে ক্রমে হইলে ভাল হয়॥[৮]

বেশ কয়েকটি বটতলার বইয়ে বিষয়টি উঠে এল। কানাইলাল সেনের *কলির দশাদশা* বহুবিবাহ নিয়ে লেখা একটি প্রহসন। প্রহসনের অন্যতম প্রধান চরিত্র হরিহর ব্রাহ্ম পুরুষদের প্রধান আকর্ষণ সম্পর্কে বলেছে— 'ঐ যে সমাজ মন্দিরে কান্‌থুড়কী বেটীদের সঙ্গে একত্রে বোসে চক্ষু বুজোবি, ঐটেই প্রধান মৎলব।'[৯] এই চোখবোজা উপাসনা ছিল অনেকের কাছে অস্বাভাবিক। দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা *চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী* প্রহসনে দুই ব্রাহ্মণের কথা-বার্তায় এ দিকটি ধরা পড়েছে—

> ১ম ॥ আজকাল কেমন চলছে মশাই?
>
> ২য় ॥ আর মাতামুণ্ডু চল্‌বে কি? কলকাতায় কেশব এক চোক্ বুজনোর দল করেচে, আর এখনকার ছোট ছোট ছোড়াগুল সেই দলে ঢুকেচে, তার ভেতর আমার অনেক যজমান আছে, সে বেটারা আর বাপমার শ্রাদ্ধশান্তি কিছুই করে না, কাজে কাজেই বাজার বড় মন্দ।[১০]

গিরিশচন্দ্র ঘোষের (ইনি নাট্যাচার্য নন) *যামিনী চন্দ্রমা হীনা গোপন চুম্বন* প্রহসনে এক ব্রাহ্মের প্রগতিশীলতাকে বিচার করা হয়েছে। প্রহসনে মুরারিবাবু একজন কেশবপন্থী ব্রাহ্ম। স্ত্রী-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে তিনি তাঁর স্ত্রী বসন্তকুমারীকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। পরপুরুষের সঙ্গে যেসব ব্যবহার দৃষ্টিকটু, তাও স্বামীর নির্দেশ বসন্তকুমারীকে করতে হয়। বসন্তের ভয় হয়। এতে তার সতীত্ব নাশের সম্ভাবনা। স্বামীকে জব্দ করার জন্য তিনি সমাজভ্রাতা মথুরবাবুর সঙ্গে মিথ্যে প্রেমের অভিনয় করেন। কিন্তু তাতেও স্বামীর হুঁশ হয় না। একদিন স্বামীর সামনেই মথুরবাবুর কোলে শুয়ে বসন্ত বলে—

> ব্রাহ্মধর্মে চুমোয় দোষ আছে? মুরারিবাবু নির্বাক। মনে মনে ভাবেন—এমন ঠেকাঠেকি? আগে জানলে ব্রাহ্মধর্মের চোদ্দপুরুষের মুখে হাগতুম, কোন শালা

> জানে এমন হিড়িক, সামনে কোলে শোবে আবার জিজ্ঞাসা কচ্চে চুমো খাবে কিনা? আমি যদি কথা কই, তবে বদরসিক হলেম।[১১]

হুতোম প্যাঁচার নকশাকে অনুসরণ করে ১৮৭৫-এ বেরোয় *হুতোম*। গোয়াবাগান স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটি কলকাতার বাবুদের নষ্টামির কথা তুলে ধরতে ছিল ওস্তাদ। অসবর্ণ বিবাহ, তিন আইনে বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতার হুজুগকে হুতোম ভালো চোখে দেখেনি। হুতোম মনে করত সংস্কারের নামে কেশবচন্দ্র ও তাঁর দলবল নারীদের অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। স্বেচ্ছাচারী নারীদের নিয়ে এদের নাচানাচি ছিল হুতোম-এর দু'চোখের বিষ—

> আজিও যে সমাজে এইরকম কুৎসিত ব্যবহার, কুৎসিৎ কার্য্য, আর কুৎসিত কাণ্ড চলে, সে সমাজের চতুষ্পদে সহস্র সহস্র দণ্ডবৎ। যে ব্রহ্মানন্দ সভা জগতের হিতব্রতে ব্রতী হয়ে, মুক্তকণ্ঠে বলেন, 'আমাদিগের বেশ্যা ভগ্নীগণ উদ্ধার হইলে, আমাদিগের চিরমঙ্গল সেই সভ্যেরা যে কার্য্যে ঘৃণা করেন, সেই কার্য্যে যাদের আদর, তেমন লোকের অস্তিত্বেও পাপ স্পর্শ করে। কুলত্যাগিনী, সমাজকণ্টকিনী, বহুবিলাসিনী পিশাচারী, যে সমাজে কুলবধূর ন্যায় আদরিণী, যে সমাজের মস্তক নাই, যে সমাজের রক্ষক নাই, যে সমাজের দায় নাই, যে সমাজের জামীন নাই, যে সমাজের মোজাহেম নাই, যে সমাজের ওয়ারিস নাই, আর যে সমাজের সাফাই সাক্ষী নাই, তেমন সমাজে পরম সুখসেব্য রাজভোগে নিত্য অবস্থান করা অপেক্ষাও ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি শ্বাপদ পরিপূর্ণ বিজন কাননে তৃণপত্র ভক্ষণ করে হুতোমের ন্যায় বাস করাও শ্রেয়স্কর।[১২]

১৮৭২-এ ১৩ মির্জাপুর স্ট্রিটে কেশবচন্দ্র স্থাপন করেছিলেন ভারত-আশ্রম। ব্রাহ্মরা এখানে আশ্রয় নিতে পারতেন। ব্রাহ্ম হরনাথবাবুর সঙ্গে এই আশ্রমে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। হরনাথবাবু তখন সপরিবারে আশ্রমের বাসিন্দা। হাত-খোলা মানুষ বলে আয়ের চেয়ে তাঁর ব্যয় বেশি হতো। ফলে হরনাথের বাজারে কিছু দেনা হয়। আশ্রমের অধ্যক্ষের অভিযোগে তাঁকে একসময় ভারত আশ্রম ছাড়তে হয়। কিন্তু আশ্রম ছেড়ে যাবার সময় ভৃত্য ও ব্রাহ্ম ভাইয়েরা তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে দেনার দায়ে অপমান করেন। হরনাথবাবুর স্ত্রী বিনোদিনী নিজের গায়ের সমস্ত গয়না তুলে দেন আশ্রমবাসীদের কাছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেশববাবুর বিরুদ্ধে উঠতে থাকে নানা ধরনের অভিযোগ। *বসন্তক* এনিয়ে একটি কার্টুন ছাপে, যেখানে কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য ব্রাহ্মদের সামনে দু'জন মহিলার ছবিও থাকে।

ক্যাপশনে লেখা হয়—আ মর ছুড়ি, ভাংলি তো ভাংলি হাটের মাঝে ভাংলি। বসন্তক এ-প্রসঙ্গে বলে—

> ভারতাশ্রমের হাঁড়ি ভাঙ্গা মেয়ে মানুষটী বলেছেন যে তাঁর সহিত যেরূপ কুব্যবহার করা হয়েছিল সেরূপ হিন্দুরাও করে না। তাই শুনে আমার বাসন্তিকা জিজ্ঞাসা করেছেন "উন্নত ব্রাহ্মদিগের এই কি উন্নতি? তা পাঠকগণ বলে দিন আমি কী উত্তর দিব।"[১৩]

ভারত আশ্রমকে সামনে রেখে কেশবচন্দ্রকে নিয়ে নাগাশ্রমের অভিনয় নামে একটি প্রহসন লিখে ফেললেন মনোমোহন বসু। *মধ্যস্থ* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত সেই প্রহসনের রচয়িতা হিসাবে অবশ্য নিজের নাম গোপন করলেন মনোমোহন, কেঁড়েলচন্দ্র চাকের নামে বেরোয় সেই লেখা। প্রহসনে ভারত আশ্রমের ঘটনায় যুক্ত হরনাথ হয়েছেন বরনাথ, তাঁর স্ত্রী বিনোদিনী শিধুমুখী, আর কেশবচন্দ্র নাগরাজ বাসুকী। কী কুরুচিপূর্ণভাবে কেশবচন্দ্রকে আক্রমণ করা হয়েছে তার নমুনা হিসাবে নাগরাজ বাসুকীর একটি উক্তিই যথেষ্ট— 'এই যে মহাপুরুষ হইছি— অবতারও হব— কার সাধ্য কে কি করে? এক কথা কবে, অমনি লাইবেল কেস এনে তার মাথা খাব।'

কেশবচন্দ্র মাদকদ্রব্য ও সুরাপানের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেছিলেন *মদ না গরল* নামে একটি পত্রিকাও। *ইন্ডিয়ান মিরর, সুলভ সমাচার*-ও এনিয়ে লেখা ছাপে। 'মাতালের পরিবার' নামে কেশবচন্দ্রের একটি কবিতা তো সেসময় অনেকের মুখে মুখে ফেরে।[১৪] কিন্তু মদ্যপানের বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্র যতই প্রচার চালান না কেন, আধুনিক ব্রাহ্মদের কর্মপদ্ধতিতে যে পরিবর্তন কেশবচন্দ্র নিয়ে এলেন, তাতে করে সুরাদেবীর কৃপাদৃষ্টি পড়ল তাদের উপরও। বটতলার সাহিত্যে তো সেরকমই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নিমাইচাঁদ শীলের *এঁরাই আবার বড়লোক* প্রহসনে গ্রামের দুই ভদ্রলোক কৃষ্ণ ও মতির কথাবার্তায় উঠে এসেছে সে কথা—

কৃষ্ণ ॥ ...তবে এখন কোথায় যাওয়া হচ্ছে?
মতি ॥ সমাজে।
কৃষ্ণ ॥ তবে যে মদ খেলে?
মতি ॥ নিবারণী সভায় তো নয়।

কৃষ্ণ ॥ তা বারদোষেই বোঝা গেছে, ব্রাহ্ম-সমাজে যাচ্চো—তাতেও কি এটা দোষ নয়?

মতি ॥ আপ্নিই বা কি কচ্চেন?

কৃষ্ণ ॥ আমাকে তো আর শ্রোতৃমণ্ডলীর সঙ্গে একত্রে বস্তে হবে না যে কেউ গন্ধ পাবেন—একাকী বেদীতে বসে বেদ পাঠ করবো।

মতি॥ সে উপায় আমিও করে্য এসেচি, দু'খান রুমাল লেবেণ্ডুরে ভিজিয়ে এনেচি। কিন্তু যদি সেন মহাশয় উপাচার্য্য আসনে বসে বক্তৃতা করেন, তবেই তো আপনার সকল বিদ্যা প্রকাশ হবে।[১৫]

কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যে উদ্দামতা নিয়ে সমাজ সংস্কারে নেমেছিল তাতে একসময় ভাটা পড়ে। অশ্লীলতা নিবারণী সভা, মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন যায় থিতিয়ে। ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে হিন্দুর আচার-আচরণ। *হরবোলা ভাঁড়* এ নিয়ে সরব হয়। ১৮৭৪-এ প্রকাশিত পাঞ্চজাতীয় এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন দুর্গাদাস ধর। ব্রাহ্মসমাজের কাজকর্ম সমালোচনার পাশাপাশি পত্রিকাটি সমকালের অনেক বিষয়ই কাগজে স্থান দিত। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে দুর্গামোহন দাস ও কেশবচন্দ্রকে *হরবোলা ভাঁড়* যে মোটেও পছন্দ করত না, পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই তা লক্ষ করা যায়। 'আমরাও কেন করি' রচনায় অবতার পূজা, ব্রাহ্মদের ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, আধুনিকতার নামে উৎকেন্দ্রিকতা এসব প্রকাশ পায়। লেখাটিতে কেশবচন্দ্রকে 'শৃগালচন্দ্র' হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। হনুমান, শূকর প্রভৃতি চরিত্রগুলি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণেচ্ছুক ব্যক্তি। সেখানে বলা হয় চিত্রকূট পর্বতে কতিপয় ব্রাহ্মধর্মীও হবু ব্রাহ্মের গোপন মজলিশ বসেছে। লেখক নিজেই ভাঁড়ের ভূমিকায়। ভাঁড় বক্তৃতা করে বলে—

> যদি তোমাদের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মণের ছেলে থাকো, সর্বাগ্রে পৈতে ফেলে দিতে হয়, আকর্ণ দাড়ি রাখতে হয়, শিশুকাল থেকেই কানা সেজে চস্‌মা পোর্ত্তে হয়, বাপ মাকে পরিত্যাগ কোর্ত্তে হয়, সকল জেতের সঙ্গে এমনকি চাচা ভায়াদের নাস্তার মজলিসেও খানা খেতে হয়, বিলিতি কথায় লেকচার দিতে হয়, বেদ ভাঙ্গা সংস্কৃত শ্লোকে ঈশ্বরের উপাসনা সেরে বেদের নিন্দে কর্ত্তে হয়, ঈশ্বরের অনন্ত নাম অগ্রাহ্য করে কেবল ব্রহ্ম নামে ডাকতে হয়।[১৬]

আদি ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে কেশবচন্দ্র যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেখানেই তখন ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গ হিসাবে বৈষ্ণবীয় কীর্তন-গান প্রচলন করেছেন।

কেশবচন্দ্র প্রতিকৃতি পূজার ব্যাপারেও নীরব থেকেছেন। পৌত্তলিকতার বিরোধিতার সূত্র ধরে যে ব্রাহ্মধর্মের যাত্রা, যেখানে স্বর্গ-নরকের কোনো অর্থ ছিল না, সেই ব্রাহ্মধর্মই একসময় এগুলো নিয়ে মাতামাতি শুরু করে। অথচ দেহে উপবীত ধারণ, শাস্ত্রীয় মন্ত্রোচ্চারণ এসব নিয়েই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের বিরোধ হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজের অনেক নিয়ম-কানুনই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে অনুপ্রবেশ করে।
এ নিয়ে *বসন্তক*-এ একটি মজার লেখা বেরোয়।

ধর্মের উন্নতি

> ধর্ম স্বরূপ ধৃতরাষ্ট্র অন্বেষণ সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে ঠাকুর ও সৈন্যদল কিরূপ যুদ্ধ করিতেছেন,—সঞ্জয় বলিলেন ঠাকুর দলের প্রধান সেনাপতি, অনেক তর্জন গর্জন বাহ্যস্ফোটন ও সংশোধন করতঃ পর্বতের গুহাতে শায়ী ইহয়াছেন। তাঁহার অনুচর সকল মাভৈ মাভৈ রব করতঃ উল্লম্ফন প্রলম্ফন করিতেছে; এই অবকাশে সেনাদল স্থানে স্থানে নিঃঠাকুর করণাভিপ্রায়ে ঝঙ্কার করিতেছে।[১৭] ...

ব্রাহ্ম-উপাসনাগৃহে 'অবতার পূজা' একসময় এমন আকার ধারণ করে যে তা হয়ে ওঠে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদের মূল চর্চার বিষয়। বটতলায় তার ছাপ পড়ে। লেখা হয় *তিন অবতার*-এর মতো প্রহসন। প্রহসনে তিন প্রধান চরিত্র— অজা বাক্যভূষণ, চাঁদ বিদ্যাবাগীশ এবং দাস তর্কালঙ্কার। এদের পাশে ভাঁড়ের ভূমিকায় অজ্ঞাতনামা লেখক। চাঁদ বিদ্যাবাগীশ কথা প্রসঙ্গে যে কথা উল্লেখ করেন, তা আসলে কেশবচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করেই। চাঁদ বলে—

> কীর্তন করিব, বাই নাচ দেখিব না, দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণে যাইব না, পৌত্তলিক ধর্মে পদাঘাত করিব, রেলওয়ে শকটে হিন্দুর সঙ্গে একত্রে বসিব না। যেদিকে স্বর্গের সিঁড়ি অগ্রে আমরা সেইদিকে ধাবিত হইব।[১৮]

এই যে স্বর্গের দিকে যাত্রা, যা ছিল ব্রাহ্ম-বিরোধী চিন্তা, এই চিন্তা প্রকারান্তরে কেশবচন্দ্রই তার সমাজে প্রচার করতে থাকেন। তাঁর সহায় হয় *ইন্ডিয়ান মিরর*। *বসন্তক* তাই *ইন্ডিয়ান মিরর*-কে ছেড়ে কথা কয়নি।[১৯] ব্রাহ্মদের যুক্তিবাদের সঙ্গে এই অসঙ্গতিপূর্ণ কার্যকলাপ নিয়ে কাব্যরসিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন

পঞ্চানন্দের বিলাতের পত্র। সেখানে বলা হয়েছে, সাধনভজনহীন, ভক্তিহীন ডোম হলা, তুলসীগাছে কিছুটা জল নিক্ষেপ করেই স্বর্গে স্থান লাভ করেছে।

১৮৮১-তে ফকিরদাস বাবাজী লিখলেন *অবতার* নামে একটি আস্ত প্রহসন। এটি যে কেশবচন্দ্রকে নিয়েই লেখা তা আর কারও বুঝতে অসুবিধা হয় না। কাহিনিটি সংক্ষেপে বলতে ইচ্ছে করছে। অবতার মাধব গুপ্ত নিজের কামরায় বসে ভাবে, ত্যাগ স্বীকারেই আসল নাম। তার ইচ্ছে, বুদ্ধ, খ্রিস্ট বা মহম্মদের মতো জগৎপূজ্য হন। লোকে তার পেছনে ফেউয়ের মতো লাগে। ইচ্ছে করে তাদের মুখ থোঁতা করে দেয়। কিন্তু চটলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে, তাই কোনো বিদ্রূপে কান দেন না। অবতার হওয়া যখন তাঁর প্রায় পাকা, একদিন শিষ্য লাবণ্য প্রস্তাব করে যিশুখ্রিস্ট যেভাবে গাধায় চড়ে জেরুজেলাম পর্যটন করেছেন সেরকম করে বেরোলে কেমন হয়। লাবণ্যের এই প্রস্তাব মাধবের মনে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে মাধব নির্দেশ দেন, যুবক একটি গাধা আনতে। একদল বাউলকে নিয়ে আসার কথাও বলা হয়। তারা পেছন পেছন গান করবে। যেই কথা, সেই কাজ। নগরে মহা হইচই। গাধার পিঠে শিষ্য পরিবৃত্ত অবতার পেছন পেছনে গান করছে বাউল—

.... তোমার কার্দ্দানী আর কেরামতে
রাজা উজীর ঘুরিয়ে ফেলে।
ঐ যে আমীর ওমরা পড়ছে ঘুরে
মেয়ের জোর সার কলিকালে॥...
নেটিভ ক্রাইষ্ট তুমিই এখন
সেভিয়ার হয়েছে হালে। ...
থাকো জলে না ছোঁও পানি
বুজরুকি কত জানালে।
দাদা, নিজে হয়ে মস্ত মাজি,
সমাজ দহে নাম ডুবালে॥
ঈশ্বর হওয়া মুখের কথা
হাতী মারা মশার হুলে।
দাদা, রাং কি কভু হয় গো সোনা,
থুতুতে কি ছাতু গলে॥[২০]

পৌত্তলিকাবাদ, অবতারত্ব নিয়ে কেশবচন্দ্রের প্রতি সমাজের তরুণ ব্রাহ্মরা অনেকদিন ধরে ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছিলেন। সে সময় সমাজের রীতি-নীতি ভেঙে কেশবচন্দ্র

তার নাবালিকা কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করেন কোচবিহারের রাজকুমারের সঙ্গে—ব্যস, আর যায় কোথায়? ব্রাহ্মসমাজে তুমুল অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়। এই কেশবচন্দ্রই ১৮৭১-এ টাউনহলের বক্তৃতায় ব্রাহ্মবিবাহের যৌক্তিকতা দেখিয়ে বাল্যবিবাহ ও অকাল বিবাহের নিন্দা করেছিলেন। কন্যার বিয়ের বয়স সেখানে চোদ্দো নির্ধারিত হয়। পরের বছর এ নিয়ে আইন হয়। অথচ কেশবচন্দ্র কিনা নিজের মেয়ের বেলায় তা অমান্য করলেন! এ নিয়ে কম লেখা বেরোয়নি। বিষ্ণু শর্মা লিখলেন একটি প্রহসন যার নাম *কপালে ছিল বিয়ে—কাঁদলে হবে কি?* এখানে কেশবচন্দ্রকে সহানুভূতিহীন বিষয়ী ভণ্ড হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি তার সহকারীদের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করে যান। সব ঘটনাকে অত্যন্ত বিদ্রুপের চোখে দেখা হয়েছে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত নাম প্রহসনে ব্যবহৃত হয়নি।[২১]

কোচবিহার বিবাহ আন্দোলনের পর কেশবচন্দ্রকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে। কেশবচন্দ্রের অনুগতদের সঙ্গে সংঘর্ষের বাতাবরণ তৈরি হয় শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ নব্য ব্রাহ্মদের। ফলস্বরূপ ১৮৭৮-এ তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। এর দু'বছর পর কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজ নববিধান নামে প্রচারিত হতে থাকে। এসময় (১৮৭৮) *পঞ্চানন্দ* নামে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে পত্রিকাটি বের করেন তাতে কেশবচন্দ্রকে বিদ্রূপ বাণে জর্জরিত করা হয়। সংখ্যা দিয়ে 'নববিধান' নামে যে কবিতা বেরোল তার পরতে পরতে ব্যঙ্গ—

১. "ব্রহ্ম মতে মাতিল মঙ্গের"।
২. "ব্রহ্ম গাঁজায় গাঁজিল গাজিপুর"।
৩. "ব্রহ্ম চরসে চৌরস চট্টগ্রাম"।
৪. "ব্রহ্ম ফিঙে ফঁপিল ফতেগড়"।
৫. "ব্রহ্ম গুলিতে গলিল গারো দেশ"।
৬. "ব্রহ্ম চণ্ডুতে চেতিল চানক"।
৭. "ব্রহ্ম ভাঙে ভোর ভাগলপুর"।
৮. "ব্রহ্ম তামাকে তর হইল তমলুক"।
৯. "ব্রহ্ম চাটে চকিত চাটমোহর"।

শুধু তাই নয়, *পঞ্চানন্দ* কেশবচন্দ্রকে এক মোক্ষম প্রশ্ন করে বসে—

দিশেহারা

তুমি কার, কে তোমার,
কারে বলো রে আনন?

নববিধানের সেন মহাশয়কে এই কথা জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে। তুমি গড়িয়াছ গির্জা, নাম রাখিয়াছ মন্দির, দাঁড়াও পুলপিটে, বলিয়া থাকো সেটা বেদি, যীশুখৃষ্টের নাম গাহিয়া তুমি পদবি ভুলাইয়াছ; হরিনাম সংকীর্তনে তুমি পথের পথিক ভুলাইয়াছ; খোল করতাল, ডোর কৌপীনে তুমি গোঁড়া গোস্বামীর চক্ষে ধূলি দিয়াছ; তোমার শঙ্খ ঘণ্টা হুলুধ্বনি দিয়া নববিধানের ধ্বজদণ্ডের বরণ করাইয়া তুমি হিন্দু কুলবধূর মন মোহিত করিয়াছ! বাবাজী! বলো দেখি, ইহার মধ্যে তুমি কার আর তোমারই বা কে! তোমার চক্ষে সোনার চশমা, চুলে বাঁকা টেড়ী, পরণে গেরুয়া, পদ্মকুটীরে অট্টালিকায় বাস করিয়া তুমি সন্ন্যাসী, স্ত্রী-পরিবারে পরিবেষ্টিত থাকিয়া তুমি বৈরাগী, কন্যার জন্য সৎপাত্রের ভাবনা ভাবিয়া তুমি যোগ সাধনে নিমগ্ন রেলের গাড়ীর গদীমোড়া কামরায় ভ্রমণ করিয়া তুমি দারিদ্র ব্রতাবলম্বী;—বাবাজী, সত্য বলিতেছি, তোমাকে চিনিতে পারিলাম না সেইজন্য সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, "তুমি কার, কে তোমার?

সামাজিক নিয়ম সমূহে যে সকল দোষ আছে, তাহার সংশোধনের জন্য তুমি বিশেষ ব্যগ্র। জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, অতিশয় অনিষ্টজনক জানিয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য তোমার বিশেষ যত্ন। জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেইজন্যই কি পরের মেয়ে আইবুড় রাখিবার আইন করাইয়া সকাল সকাল আপনার মেয়েকে রাজরানী করিয়া দিলে? সেই জন্যই কি হিন্দুর ছত্রিশ জাতির উপর নিজের একটা দল আর ঝগড়া করিয়া আরও একটা ভাঙ্গা দল বাড়াইয়া বোঝার উপর শাকের আট করিয়া দিলে? বলো দেখি বাবাজি, তুমি বাস্তবিক কোনদলের, আর তোমার আসল মতখানাই বা কি?

তুমি পৌত্তলিক, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না, অথচ তোমার মন্ত্র তন্ত্র আছে, তাহাতে বাবা ভগবান পৃথক পৃথক আছে; ভগবানের পদ্ম আঁখি, রাঙা চরণ আছে। তুমি মুসলমান, তাহাও বলিবার যো নাই, তবু মক্কা মদিনায় মহম্মদের কাছে তোমার তীর্থ ভ্রমণে যাওয়াটুকু আছে। তুমি খৃষ্টান নও, কিন্তু খৃষ্ট পুরাণের ব্রত পর্ব্বের অনুষ্ঠানে তোমার ত্রুটি দেখি না। কত বলিব? আমি হতভম্ব হইয়াছি, তুমিই আমাকে দিশেহারা করিলে?[২২]

শেষকথা

বটতলা সাহিত্যের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্যই হলো সমকালের ঘটনা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা। এমন ব্যাপার খুব কমই আছে, যা বটতলার লেখকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, ব্যক্তিগত কেচ্ছাকাহিনি সবই স্থান পেত সেখানে। সত্যি-মিথ্যার মিশ্রণে এ-এক অন্য ধরনের সংস্কৃতি। মুখে বড়ো বড়ো কথা বললেও অনেকেই গোপনে বটতলার বই সংগ্রহ করতেন। তাছাড়া বটতলা মানেই তো আর পর্নোগ্রাফি নয়, হরেক কিসিমের বই-ই তো বটতলার প্রকাশকরা ছাপতেন। তবুও বটতলার প্রতি কেশবচন্দ্র বিদ্বেষ প্রকাশ করেছিলেন কেন? এর বাস্তব কারণটা সহজেই বোঝা যায়। যে ধরনের সংস্কার-আন্দোলনের সঙ্গে কেশবচন্দ্র যুক্ত ছিলেন, সেখানে বটতলা সম্পর্কে নীরব থাকাটা ছিল কার্যত অসম্ভব। বটতলার বই নিয়ে একশ্রেণির মানুষ যে অনেকদিন ধরে বিরক্তি প্রকাশ করে আসছিলেন, তাকেই তুরুপের তাস করেছিলেন তিনি। বিদেশ ঘুরে আসা, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কেশবচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে বটতলা সম্পর্কে যাই-ই মনে করুন না কেন, একটি ধর্ম সমাজের নেতা হিসাবে 'শুদ্ধাচারের' প্রতি তাঁকে দৃষ্টি দিতেই হয়েছে। আর তাতে করেই বটতলার বইয়ের বিরুদ্ধে তিনি শুধু প্রচার চালিয়েই ক্ষান্ত হননি, রীতিমতো সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর বটতলা-বিরোধী পদক্ষেপে কম হেনস্থা হতে হয়নি লেখক-প্রকাশকদের। ফলে তিনি ও তাঁর ব্রাহ্মসমাজের কার্যকলাপকে বটতলা আক্রমণ করেছে স্বাভাবিক ভাবেই। একথাও ঠিক যে, নিত্য-নতুন সমাজ সংস্কারের ভাবনা ব্রাহ্মনেতা হিসাবে তাকে খ্যাতি দিয়েছিল। আবার পরবর্তীতে তাঁর কথা ও কাজে দেখা গিয়েছিল বিস্তর ফারাক। ভালো-মন্দ দু'দিক থেকেই ব্রাহ্মসমাজের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিলেন তিনি। সঙ্গত কারণেই তিনি বটতলার লেখকদের খোরাক হয়েছিলেন।

সূত্রনির্দেশ

১. 'গালাগালি', *সুলভ সমাচার*, ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০, *সুলভ সমাচার ও কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্রবাণী*, যোগেন্দ্রনাথ গুহ সংকলিত, দ্বি.সংস্করণ ১৩৯৬ কলকাতা।

২. 'জঘন্য ভাষা', *সুলভ সমাচার*, ৪ঠা ভাদ্র ১২৮০, ঐ।
এই প্রবন্ধে বিদ্যাপতি ও দাশুরথি রায়ের বই পড়া 'পাপ' বলে কেবশচন্দ্র মত দেন। বুক রেজিস্ট্রারি অফিস থেকে বইয়ের দোকানে দোকানে গিয়ে অশ্লীল বই যাতে চিহ্নিত করা হয় এবং সেই অনুযায়ী সরকারের কাছে রিপোর্ট করা হয় সেকথাও বলা হয়।

৩. 'আদিরসের বই, আইনের শাসন', স্বপন বসু, *অনুষ্টুপ* বটতলা বিশেষ সংখ্যা ২০১১, কলকাতা।

৪. ঐ।
'অশ্লীলতা শব্দ মোরা আগে শুনি নাই। ঔপনিবেশিক বাংলায় 'অশ্লীলতা'র স্বরূপ নির্ণয়' সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান*, ২০০৮, অনুষ্টুপ, কলকাতা।

৫. ১৮৭৩-এ প্রকাশিত। সেকালের জনপ্রিয় কাহিনি তারকেশ্বরের মোহান্তের সঙ্গে। 'এলোকেশীর কেচ্ছা' প্রহসনের মূল বিষয়। নাটকের শুরুর দিকে এলোকেশীর স্বামী নবীনকুমার ও তাঁর কলকাতার বন্ধুদের কথাতে কেশবচন্দ্র ও তাঁর সমাজের কথা আছে।
সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন, জয়ন্ত গোস্বামী, ১৩৮১, কলকাতা।

৬. এ ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টাই বেশি চোখে পড়ে। ২৯ চৈত্র ১২৭৭ *সুলভ সমাচার*-এ তিনি লেখেন— সকলে বলে এখন সভ্যতার প্রাদুর্ভাব। কোনরূপ অসভ্যতা এখন জনসমাজে তিষ্টিতে পারে না। ইহা শুনিলেও কর্ণ জুড়ায় এবং সত্য হইলে এটি অত্যন্ত সুখের বিষয়। মাতৃভূমির গৌরবের কথা শুনিলে কাহার হৃদয় না প্রফুল্ল হয়? কিন্তু মদ খাইয়া ঢলাঢলি করা, উলঙ্গ হইয়া পথে চলা, হাজার হাজার লোকের সম্মুখে অবিশ্রান্ত অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করা, এই সকল যদি লেখাপড়ার চরম মান হয় এবং ইহাই যদি সভ্যতার লক্ষণ হয় তবে এই দুষ্ট সরস্বতীকে যত শীঘ্র শতমুখী এবং কুলার বাতাস দিয়া বিদায় করা যায় ততই দেশের মঙ্গল।...

৭. *বসন্তক*, দ্বিতীয় খণ্ড, দশম সংখ্যা, ১৮৭৪।
বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বলা হয়— এর বিদ্যাসাগর জন্মদাতা/ *বঙ্গদর্শন*-এর নেতা।

৮. *বসন্তক*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৮৭৩।
এই লেখাটির পাশাপাশি 'রামশরণ পালের জয়' নামে একই ধরনের আরেকটি লেখা ছাপা হয়।

৯. অমৃতলাল বসুর *গ্রাম্য বিভ্রাট* প্রহসনে নেশাখোর মানিক বলেছে— ... সমাজের দিন সকালবেলা খোয়ারী ভেঙ্গে রাখ্‌বো, বৈকালে বরং মটর ভোর আফিং দিও, তাহলে আপনা আপনি চুক্ষু বুঝে আসবে, বেশ ভাবের জমাট হবে।

১০. *সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন*, প্রাগুক্ত।

১১. ঐ।

১২. *হুতোম*, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৮৭৫।

১৩. *বসন্তক*, প্রথম খণ্ড, সপ্তম সংখ্যা ১৮৭৩।

১৪. কবিতাটি ছাপা হয় *সুলভ সমাচার* ২৯ চৈত্র ১২৭৭-এর ২২তম সংখ্যায়।

মাতালের পরিবার

বাবা গো তোমার তরে
মা আমার প্রাণে মরে,
তুমি না দেখিলে বাবা কে দেখিবে বলনা?
বাবা তুমি ঘরে এস না॥
সারাদিন গেল বয়ে,
আছি উপবাসী হয়ে,
সুরেন, নবীন কাঁদে বোঝালে সে বোঝে না
বাবা তুমি ঘরে এস না॥
মা আমার একা ঘরে,
পড়ে জল জল করে
বলেন সহেনা প্রাণে আর রোগ যাতনা
বাবা তুমি ঘরে এস না॥
দুই বিনা সারাদিন,
মড়ার মতন ক্ষীণ
হয়ে যে ধুঁকিছে খুকি কাঁদিতে যে পারে না
বাবা তুমি ঘরে এস না।
চেয়ে দেখ একবার
টানিতে পারি না আর,
মাথা ঘোরে দাঁড়াবার শক্তি আর হয় না
বাবা তুমি ঘরে এস না॥
চক্ষের জলেতে ভাসি বিষণ্ণ অন্তরে,
এরূপে ডাকিলে শিশু বহুক্ষণ পরে
মেলিল পাপিষ্ঠ শেষে আরক্ত নয়ন।
আঁখি মেলি ক্রোধভরে করিয়ে তর্জ্জন,
কোমল অঙ্গেতে তার করিল প্রহার।
একে যে বালক তাতে আছে অনাহার,
প্রহার খাইয়া বাছা মূর্চ্ছিত হইল
ঘুরিয়া পড়িল দাঁতে কবাটি লাগিল॥

১৫. প্রহসনটির প্রকাশ ১৮৬৭।
'উনিশ শতকের বাঙালির মদ্যপান ও বটতলা', কৌস্তভমণি সেনগুপ্ত, *অনুষ্টুপ* বটতলা বিশেষ সংখ্যা ২০১১, কলকাতা।
সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন, প্রাগুক্ত।

১৬. 'উনিশ শতকের ব্যঙ্গ পত্রিকা', স্বপন বসু, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, সাময়িকপত্র বিশেষ সংখ্যা, ১১৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৪১৩।

১৭. *বসন্তক*, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা ১৮৭৩।

১৮. *সেকালের বাংলা সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের ব্যঙ্গ রচনা*, ড. মণীন্দ্রনাথ বড় পণ্ডা, প্রথম সংস্করণ ১৪১৩, কলকাতা।

১৯. *বসন্তক*, প্রথম খণ্ডের, প্রথম সংখ্যা। তৃতীয় সংখ্যা ১৮৭৩-এ কেশবচন্দ্রের *ইন্ডিয়ান মিরর*-কে সমালোচনা করেছে।

২০. *সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন*, প্রাগুক্ত।

২১. ঐ।

২২. 'উনিশ শতকের ব্যঙ্গ পত্রিকা', প্রাগুক্ত।

বাসন্তিকা— আ মর্ ছুঁড়ি, ভাংলি তো ভাংলি হাটের মাঝে ভাংলি।
সামনের গলবস্ত্রে হাতে লোকটি কেশবচন্দ্র সেন।

অত্যুন্নত ব্রাহ্ম (ঘরের বৌকে) টেনে বার করো— স্লোগান ছিল নব্য ব্রাহ্মদের। হিন্দু যুবকরাও চেষ্টা করত বৌদের ব্রাহ্মদের প্রার্থনা সভায় নিয়ে যেতে। এদিকে বৌরা গোরু ও শ্বশুরের জন্য বাইরে যেতে সাহস করতেন না।

চিত্রকূট পর্ব্বত। সুগ্রীবকৃষ্ট, শৃগালচন্দ্র, হনুপ্রসাদ, ব্যাঘ্রলাল, ও শূকরদাষের সভা।
নিকটে উল্কামুখী গুপ্ত, পার্শ্বে ভাঁড় দণ্ডায়মান, আকাশে পূর্ণ চন্দ্র।

হরবোলা ভাঁড় ১৮৭৪
গোপন মজলিশে শৃগালচন্দ্রের (কেশবচন্দ্রের) যোগ

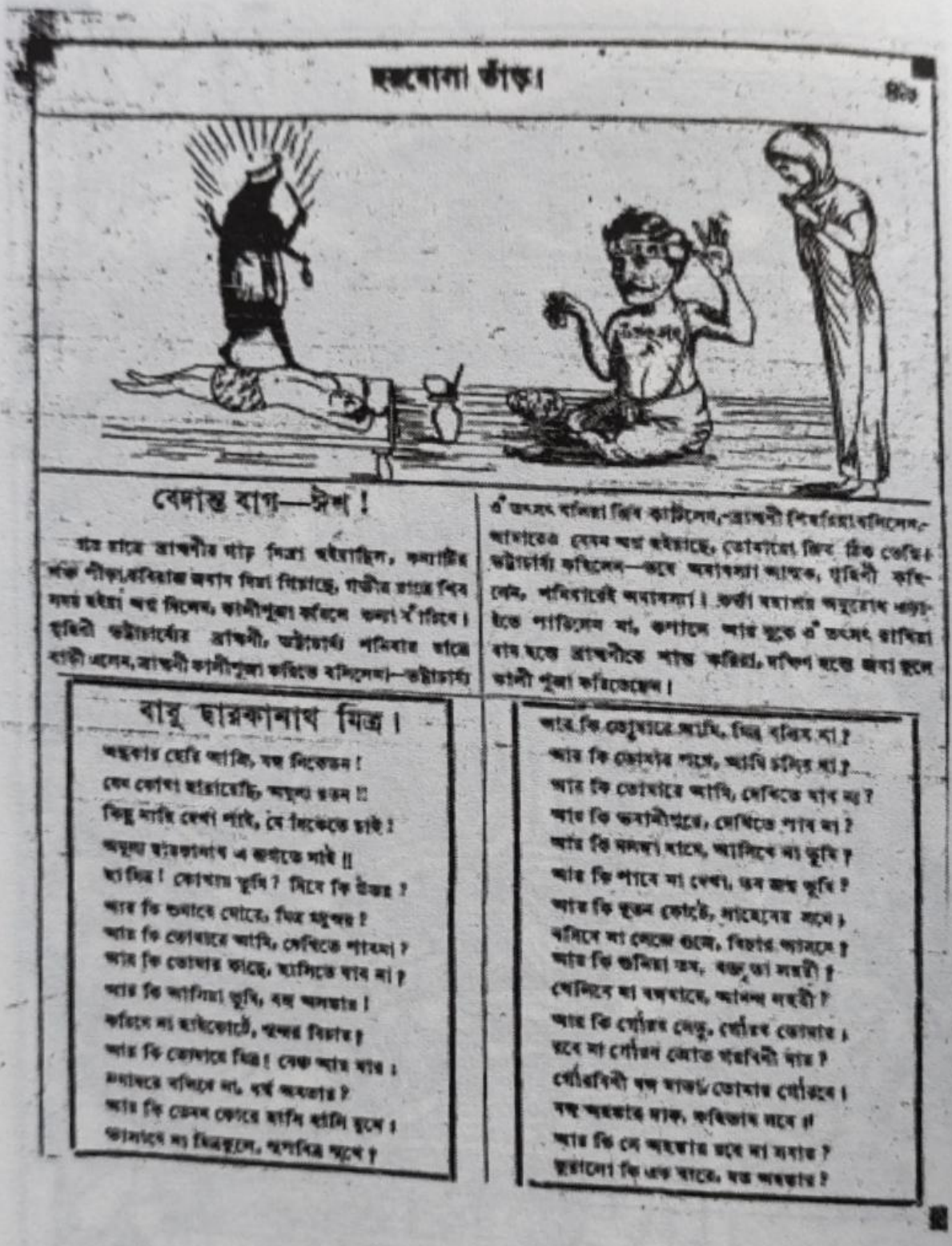

হরবোলা ভাঁড় ১৮৭৪
ব্রাহ্মের (কেশবচন্দ্রের) কালীপূজা